পর্ব

পর্ব-৫, উম্মাহর মহীরুহ

Asif Adnan

June 19, 2019

8 MIN READ

চলুন এখন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ এর দাওয়াহর কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা যাক। তার দাওয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল? কিভাবে সে সময়কার পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিলা অন্যায় অনাচারে, আমরা ইতোমধ্যে তা জেনেছি। তাওহীদ এবং আক্বিদা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। ইমাম মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীরা যখনই যমীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন তখনই তারা নজর দিলেন শিরকের মূলোৎপাটনের দিকে, এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো শান্তির আবাসস্থলে পরিণত হলো।

প্রথম যে কাজটি তিনি করেছিলেন তা হলো তাওহীদ এবং শিরকের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করা। এ বিষয়টি তিনি সবসময় মাথায় রাখতেন। চলুন বাস্তবতার নিরিখে জিনিসগুলোর ওপর আলোকপাত করা যাক।

প্রথমত: তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রবৃত্তি বা খেয়াল খুশির অনুসরণ না করে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'কিতাব আত-তাওহীদ' পড়লে দেখবেন যে তিনি সেখানে বলছেন, কুরআন সুন্নাহর দিকে ফিরে আসুন। এটি একটি অনন্য সাধারণ বই যা দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। সাধারণত বই লেখার সময় মানুষ প্রথমে একটি ভূমিকা লেখার চেষ্টা করবে। কিতাব আত তাওহীদে কোন ভূমিকা নেই।

বইটি শুরু হয়েছে এ কথা দিয়ে -
আল্লাহ কুরআনে বলছেন: ''আমি মানুষ ও জ্বীনকে কেবল আমরা ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (৫১:৫৬)

কিতাব আত-তাওহীদের পুরো বইটিতে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পরিচ্ছদের পর পরিচ্ছদ তিনি কেবল কুরআন এবং হাদীদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে গেছেন। সাধারণ মানুষ যখন এই বইটি দেখে তখন তারা ভাবে বইটি কতো সাদামাটা এবং ছোট। এ বইয়ের লেখক নিশ্চয় খুব বড় মাপের জ্ঞানী কেউ নন। আমি আপনাদেরকে বলছি মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াহ্হাব নিজে থেকে কিছুই বলেননি। যদি আপনি তাঁকে অভিযুক্ত করতে চান, কাঁঠগড়ায় দাড় করাতে চান, তাহলে ইবনু তাইমিয়্যাহ বা ইবনু কাসীর রাহিমাহুমুল্লাহ কেও কাঠগড়ায় দাড় করান। কিংবা আয যাহাবীকে। কারণ তাঁর আগে এই মহান ব্যক্তিবর্গও একই পথের পথিক ছিলেন। যারা রাসুল (ﷺ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। যদি আপনি তাঁর কথা নিয়ে আপত্তি তোলেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ নিয়েও আপত্তি তুলুন, কারণ তিনি কেবল কুরআন এবং সুন্নাহর কথাই বলেছেন, আর কিছু না।

আল্লাহর কসম! তিনি নতুন কিছু আনেননি। কোন আয়াত অথবা হাদীস উল্লেখ করার পর কোন মন্তব্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তিনি সে বিষয়ে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করছেন। তিনি এমনই একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন যিনি সরাসরি কুরআন সুন্নাহর উপর আমল করতেন। কুরআনের আয়াতের ব্যবহারিক প্রয়োগে তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি এতটা খ্যাতি ও সাফল্য অর্জনের কারণ হল তাঁর অনুসৃত নীতি নতুন কিছু ছিলনা। বরং বহু আগে থেকেই এর প্রচলন ছিল।

সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় আপনি যদি স্রোতের অনুকুলে যেতে থাকেন তাহলে সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, কিন্তু যখন আপনি স্রোতের প্রতিকূলে যাবেন তখন আপনার বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে। আকীদাহর ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিলেন এমন প্রতিকূল এক অবস্থানে।

সে সময় সক্রিয় ছিল শিরক, সুফীবাদ, বিদআত এবং নানা ভ্রান্তগোষ্ঠী, এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সময় থেকে সেসময় পর্যন্ত আর কখনো মুসলিম সমাজে এ সমস্যাগুলো এতোটা প্রকট আকার ধারণ করেনি। তাই তাঁকে চলতে হয়েছিল প্রবল স্রোতের

প্রতিকূলে, এবং এই প্রচেষ্টাই তাঁকে পূর্ববর্তী অনেক আলিমগণের চেয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। তিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন মাত্র ২৫০ বছর আগে। মানুষ সাধারণত মৃত্যুর পর বেশিদিন আলোচিত হয়না, কিন্তু তাঁর মতো মহীরুহরা মৃত্যুর এতদিন পরও সমানভাবে আলোচিত হয়। তাঁর নামে যত গীবাহ আর কুৎসা রটানো হচ্ছে সেগুলোর মাধ্যমে কবরের মাটিতে শায়িত থেকেও তিনি পূন্য অর্জন করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রথম কাজ ছিলো লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া। তার যে কোন বই নিয়ে দেখুন, খুব সাধারণ বই। যেমন আল উসুল আস-সালাসাহ। আড়ম্বরহীন একটি বই। এই বইটি আকীদাহ নিয়ে লেখা, আর আকীদা হলো সহজ সরল। তিনি উম্মাহকে দেখিয়েছিলেন আকীদা আর তাওহীদ কত সরল এবং সাদামাটা। আকীদা হচ্ছে আমাদের শরীরের কাঠামো বা কঙ্কালের মতো যা আমাদের গঠন প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। যদি এটা ভালো থাকে তাহলে আপনিও ভালো থাকবেন। যদি কাঠামো খারাপ হয় তাহলে আপনিও খারাপ। ব্যাপারটা অনেকটা বাড়ির ভিতের মতো। যদি ফাউন্ডেশন বা ভিত মজবুত হয় তাহলে বাড়ী হবে মজবুত এবং দৃষ্টিনন্দন। আর যদি এর ব্যাত্যায় ঘটে, তাহলে এটা যেকোন দিন ভেঙ্গে যেতে পারে। এটি ছিল তার শিক্ষার মূল বিষয়।

আপনি কুরআন সুন্নাহর কথাই ধরুন, মানুষের সহজাত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা সম্পূর্নভাবে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু সমস্যা হয় যখন আপনার বিবেক এবং চিন্তাচেতনা অসৎ মানুষ ও দূষিত চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আজকে যদি একটি ফিকহী ইস্যু এবং একটি আকীদাহর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে দেখবেন প্রত্যেকেরই ভিন্ন মতামত আছে। আমরা যখন কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করব এবং যদি আপাতভাবে কোন সাংঘর্ষিকতা দেখি তাহলে আমরা ধরে নেব এটি আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, কুরআন সুন্নাহ থেকে ননা।

দ্বিতীয়ত: তাঁর দাওয়াহর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল কোন নির্দিষ্ট গ্রুপকে উদ্দেশ্য না করে সার্বজনীন দাওয়াহ করা। সববয়েসী মানুষকেই তিনি দাওয়াহর আওতাভুক্ত করতেন। যেমন আমি কেবল যুবকদেরকেই দাওয়াহ দেই। আমাদের হালাক্কাগুলোতে কোন বয়স্ক লোক নেই। বয়স্ক লোকেরা কখনও যুবকদের মতো খোলা মনের অধিকারী হতে পারেনা। ইতিহাসের পাতায় এর অসংখ্য সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কুরআনে মুসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে বর্ণনা করার সময় বলা হয়েছে, ''শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক লোকদের একটি দল তার উপর ঈমান এনেছিল'। ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ এর মতে এই দলটি ছিল যুবকদের দল। মুসা আলাইহিস সালাম কি তার সময়ের সব লোকদের দাওয়াহ দেননি? অবশ্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু সাড়া দিয়েছিলো কারা? যুবকরা। আর সাধারণত সব যুগে এমনটাই হয়ে থাকে। এটা সত্য যে অনেক বয়স্ক লোক তাঁদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পেরেছেন, কিন্তু এটা তুলনামুলক কঠিন। অন্য দিকে যুবকরা তাদের মনে উদিত হওয়া বিভিন্ন সংশয় আর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। আর এভাবে সঠিক পথ চিনে নেয়।

সুরাতুল কাহফে বর্নিত গুহাবাসীদের ঘটনার নায়ক ছিল যুবকরাই; যেখানে আল্লাহ তাঁদের জন্য সূর্যের পথ পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। হাজার বছর আগেকার কথা। কোন এক উৎসবের দিনে সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। সেই যুবকরা এটার বিরোধিতা করল এবং বলল আমরা মূর্তিপূজার মতো জঘন্য কাজ করতে পারিনা। তাঁদের শাসক তাঁদেরকে বাধ্য করলেও তারা মাথানত না করে পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এভাবেই এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সম্মানীত করেছেন। এমনকি তাঁদের কুকুরটির কথাও আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

কিংবা সেই কিশোর বালকটির কথা মনে করুন যে ঈসা আ: এর পরে এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর আগের সময়ে পৃথিবীতে এসেছিল। যে গোটা বিশ্বের বিপরীতে দাড়িয়ে গিয়েছিল। সুরা বুরুজে আল্লাহ বলছেন, 'ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা'। যে বালককে হত্যার পর রাজা পরিখা খনন করে প্রত্যেক তাওহীদবাদী মানুষকে হত্যা করেছিল। রাজা বলেছিল আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। সেই বালকটি ছিল অত্যন্ত শক্তভাবে তাওহীদে বিশ্বাসী। এটি অনেক লম্বা এক কাহিনী। এর মূল কথা হলো প্রথমে রাজার সেনাবাহিনী বালকটিকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বালকটির বদলে যারা তাকে হত্যা করতে গিয়েছিল তারাই সবাই পড়ে গিয়ে মারা গেল। বালক জীবিত অবস্থায় ফিরে আসল। সে ছিল এক মহান

দাওয়াতী মিশনে নিয়োজিত।

দ্বিতীয়বার তারা তাকে জাহাজে করে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গেল। তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে চাইল। কিন্তু এবারও অন্যরা মারা গেল আর অক্ষত অবস্থায় ফিরে এল বালকটি। এরপর বালকটি রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা কখনোই আমাকে হত্যা করতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে আমাকে হত্যা করার উপায় বলে দেব। আর আমাকে মারার উপায় হল, সব লোকদের এক জায়গায় সমবেত কর, তারপর 'এই বালকের রবের নামে' বলে আমার দুচোখের মাঝ বরাবর তীর নিক্ষেপ কর।

এবং তাই করা হলো এবং এ ঘটনা দেখার পর উপস্থিত সবাই বলে উঠল 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। মাত্র ১৩ বছর বয়সি একজন বালক! এটা ছিল সেই সময় যখন আল্লাহ একটি কোলের শিশুকেও কথা বলার শক্তি প্রদান করেছিলেন। শিশুটি যখন দেখল তার মা আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছে, তখন সে বলল, আম্মা আপনি ঝাঁপ দিন, কারণ আপনি তো সত্যর উপরে আছেন। শিশুটির কথা শুনে তার মা আগুনে ঝাঁপ দেয়। আল্লাহ এই ঘটনাটি কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একজন বালক পুরো উম্মাহকে পুনর্জীবিত করেছিলো।
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব যথাযথ সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে কথা বলেছিলেন আলাদাভাবে। যার যেরকম ধারণক্ষমতা, বোঝার ক্ষমতা সেট অনুযায়ী তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। তাঁর আদবের দিকে যদি আপনি খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন নম্রতা এবং শিষ্টাচারে তিনি অগ্রগামী ছিলেন।

আফসোস তার বংশধরেরা বা তাঁর অনুসারী দাবীদারগণ যদি তাকে সত্যই অনুসরণ করত! কিছু ভাই আছেন আল্লাহ তাদেরকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, তারা কেবল আকীদাহর একটি দিক শিখে সেটাকে যথেষ্ট মনে করছে। আমরা দেখছি তারা তাদের পিতা মাতাকে অসম্মান করছে। তারা তাদের নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে দূর্নামের অধিকারী হচ্ছে।

তাই আমরা প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াহ প্রচারের কথা বলি। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর সময়কার আশআরী শায়খদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজনের সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি বসবাস করতেন আহসাতে। ইমাম মুহাম্মাদ যখন তাঁর কাছে গেলেন তখন সেই শায়খের কাছে থাকা বুখারীর প্রথম খন্ড খুললেন, এবং সেখানে তাঁর লেখা একটি অসাধারণ উক্তি দেখতে পেলেন। এ উক্তিটি পড়ার পর ইমাম মুহাম্মাদ অনুধাবন করলেন এই শায়খ গভীরভাবে সত্যকে ভালোবাসেন। পরে এই আশআরী শায়খ ইমাম মুহাম্মাদকে একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের দাওয়াহর যে বিষয়গুলো তাঁর কাছে বিচ্যুতি এবং ভ্রান্ত মনে হয়েছিল, চিঠিতে তিনি সেগুলো তুলে ধরলেন। জবাবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবও একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীলসহ একে একে নিজের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করলেন। এবং তিনি চিঠিটি লিখলেন সর্বোচ্চ আদবের সাথে। এবং তিনি চিঠিতে লিখলেন, ওয়াল্লাহিল আযীম! আমি প্রতি সালাতে, প্রতি সুজুদে আপনার জন্য দুআ করি কারণ আমি দেখি যে আপনি সত্যকে ভালোবাসেন এবং সত্যের অনুসরণ করেন। যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কথাগুলো লিখলেন তিনি ছিলেন একজন আশআরী এবং সেসময়কার আশআরীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তি। এছাড়াও পুরো চিঠি জুড়ে তিনি আরো সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী শব্দ ব্যবহার করেন।

এমনই ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব । তিনি যুবকদের সাথে কথা বলতেন তাদের ভাষায়। মাঝবয়সী এবং বৃদ্ধদের সাথেও কথা বলতেন। আমীর এবং নেতাদের কাছে তিনি চিঠি পাঠাতেন। তাঁর দাওয়াহ থেকে বাদ পড়তে তো না ব্যবসায়ীরাও। সবার কাছে তিনি দাওয়াহ পৌছে দিতেন, চিঠি পাঠাতেন। এমন কেউ ছিলোনা যাকে তিনি দাওয়াহ দেননি। এটি ছিল তার দাওয়াহ মিশন সফল হবার অন্যতম কারণ।